



**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 440 - 453

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: [trisangamirj@gmail.com](mailto:trisangamirj@gmail.com)

(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

## ভারতকন্যা ভগিনী নিবেদিতা ও মীরাবেন : বিবেকানন্দ ও গান্ধির দুই শিষ্যার জীবন ও কর্মের দৃষ্টিতে সমকালীন ভারতবর্ষ

ড. অজয় কুমার দাস

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

চেতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

Email ID: [ajoy.003@rediffmail.com](mailto:ajoy.003@rediffmail.com)

**Received Date 16. 03. 2024**

**Selection Date 10. 04. 2024**

### **Keyword**

*Nibedita,  
Mirabehn,  
Vivekananda,  
Gandhi, India.*

### **Abstract**

*Two great ladies, sister Nibedita and Mirabehn in their times became truly the daughters of mother India. Dependent India was their love, their dream. Poverty-stricken, malady-ridden India, covered by the clouds of superstitions, became their walk of life. These two distinguished foreign noblewomen, holding the candle of love and bliss for the welfare of mankind, walked on the dark paths of India and turned out to be the real torchbearer. Embracing misery they dedicated their life to the cause of welfare of humanity. Nibedita served the distressed humanity following with all heart the great ideals of Swami Vivekananda. She extended her pitious hand to the suffering people in the epidemic like plague and natural calamities like flood, drought. She discharged her extraordinary service for the development of underprivileged women. In her thoughts of India, patriotism and participation in freedom movement, her inquisitiveness and ideals were successfully reflected. Indians will remain ever indebted to her for her untiring contribution in pursuit of unity in diversity.*

*On the other hand, Mira Behn, an unctuous figure, an idol of sacredness, carrying the banner of saintlike image of Gandhiji, came to India from remote England. She heartily followed his path and gave him worthy assistance in leading his philanthropic and political activities. Young Madolin Slad became his daughter. Gandhiji adorably renamed her as Mira Ben following the name of mythical character, devotee of Lord Krishna, Mira. She came to India in 1925 and India became her pilgrimage. She took bramhacharya, began to wear white saree, became vegetarian, participated in freedom movement, got imprisoned, nursed the sick, helped the distressed and what not. Inspired by Gandhiji's ideals, she did cultivation, animal husbandry, bees conservation, cane work. After Gandhiji's assassination she stayed in India for eleven years more. She returned to England in 1959. At last she spent the rest of her life in Viena of Austria since 1960.*



*Nibedita and MiraBehn both had been mingled with the cultural heritage and spirit of India. Both kindling the light of love and welfare created a new road for the women to be flourished. The two great souls have remained in the olympus of truth.*

## Discussion

### এক

“Religion is not passive and static. It is dynamic, ever growing. This truth remains for us to prove.”

ধর্ম স্থিতিশীল নয়, তা গতিশীল। একথা লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ‘Religion and Dharma’ গ্রন্থে। নিবেদিতার মাতৃভূমি উত্তর আয়ারল্যান্ড। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল (১৮৬৭-১৯১১) হয়ে উঠেছিলেন ভারতকন্যা। ঈশ্বরের অধ্যাদেশ কিনা জানা নেই, অনিবার্য কার্যকারণের সম্পর্ক সূত্রও ঠিকঠাক মেলে না। তবুও এক অদৃশ্য সংকেত সূত্রে দুই অপরিচিত জীবন ভিন্ন রেখায় কখন যে গ্রন্থিবদ্ধ হয়, কে বলতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয়ও এমনি অনির্দেশ্য কিন্তু অনিবার্য। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে এই অ্যাংলো-আইরিশ বংশোদ্ভূত কন্যাটি লণ্ডনে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এক আলোচনা চক্রে উপস্থাপিত বিবেকানন্দের বক্তৃতা তাঁর অন্তরকে আলোড়িত করেছিল। তাঁর জীবনে গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসে। এরপর ভারতবর্ষকে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নেন। স্বামীজির আস্থান তাঁর অন্তর স্পর্শ করল। তিনি ভারতে চলে আসেন। এবং তিনি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দ তাঁর নামকরণ করেন ‘নিবেদিতা’। তিনি হয়ে ওঠেন স্বামীজির শিষ্যা ও মানসকন্যা। ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা পাশ্চাত্য কন্যা এই নিবেদিতা হলেন প্রথম ভারতীয় সন্ন্যাসিনী। স্বামীজিকে তিনি গুরুপদে বরণ করেছিলেন। ১৯৯৫ সালের ঘরোয়া আলোচনায় বিবেকানন্দের মুখ থেকে তিনি শনেছিলেন বেদান্ত দর্শনের মুগ্ধ ব্যাখ্যা। অভিভূত তিনি। তারপর ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল এই রমণীর ধ্যান-জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) কাছে তিনি হয়ে ওঠেন ‘লোকমাতা’। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ‘ভারতমাতা’র যে ছবিটি ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের স্মারক রূপে ধরা হয়, সেটির অনুপ্রেরণা ছিল নিবেদিতার ‘কালী, দ্য মাদার’ (‘Kali, The Mother’, ১৯০০ খ্রীঃ, মাতৃরূপা কালী) গ্রন্থটি। ভারতবর্ষই হয়ে উঠল নিবেদিতার প্রেম, ভালোলাগা ও ভালো থাকা। কিন্তু এ ভালো থাকা আকাশ থেকে ঝরে পড়া মুক্তো বৃষ্টি নয়। মানব কল্যাণের সাধনা সহজ পথ ধরে আসে না। নিবেদিতার কর্মক্ষেত্র দারিদ্র্য দীর্ণ রোগজর্জর ভারতবর্ষ। অশিক্ষা - অস্বাস্থ্য - অপুষ্টি ও সংস্কারাচ্ছন্ন কূপমন্ডুক ভারতবর্ষ। কণ্টকাকীর্ণ এবং কর্দমাক্ত। কুজ্জটিকা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন এ পথে দীপশিখাধারিণী তিনি ছিলেন যথার্থ আলোকযাত্রী। দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই তিনি মানবকল্যাণের মহত্তম সংকর্মে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

কোন কোন নরনারী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা মানবজীবনের স্বাভাবিকতার বিপক্ষে জীবন পরিচালনা করেন। যাঁদের জীবনচর্যা এবং কার্যধারা গতানুগতিক মানুষের সঙ্গে মেলে না। নিত্যদিনের দৈনন্দিন কাজকর্মে অভ্যস্ত মানুষ এমন চরিত্রকে নিয়ে ভেবে উঠতেই পারেন না। স্বভাবতই সাধারণ চরিত্রের মধ্যে জন্ম হয় এক কল্পনাভীত বিস্ময়বোধ। ইংল্যান্ড কন্যা ম্যাডেলিন স্লাড (Madeleine Slade, মীরাবেন, November 1892-20 July 1982) তেমনই এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। আমাদের দৈনন্দিন দীনতার অসম ভারতবর্ষে যাঁকে ঠিক মেলানো যায় না। তবুও তিনি মিলিয়েছেন। এক আলোকের দিব্য-জ্যোতি-প্রতিমা এই ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখেছিলেন, তিনি ‘মীরাবেন’ (Mirabehn or Meera Behn)। মহাত্মা গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮) তাঁর শিষ্যর এমন নামকরণ করেছিলেন কৃষ্ণ উপাসিকা ভারতীয় সাধিকা মীরার নাম অনুসারে।

মীরাবেন ভারতে আসার পূর্বে গান্ধির বিরাট ভাবমূর্তিকে বহন করে এনেছিলেন। সেই সুদূর ইংল্যান্ড থেকে তরুণী ম্যাডেলিনের কাছে ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল মন্দির। সেই বিদেশিনী, তিনি ছিলেন তেমনই পবিত্র মন্দিরের পূজারিণী। একথা ঠিক, ভারতবর্ষের বিরাটত্বকে কোন কিছু দিয়েই পরিমাপ করা যায় না। তবুও সেই মহিমাম্বিত বিরাটত্বের সঙ্গে আমাদের বাস্তবের ভারতবর্ষে গান্ধিকে বড় মানানসই মনে হয়। মনীষী রোঁম্যা রোঁল্যা (Romain Rolland, ১৮৬৬-১৯৪৪) তাঁর ক্ষুদ্র

গ্রন্থ ‘Mahatma Gandhi The Man who become one with the Universal Being’ – এ পরিণত আন্তর্জাতিক মানুষটির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে –

“This is the great message to the world, or, as Gandhi puts it, India’s message-self-sacrifice.”<sup>2</sup>

আমাদের এই পৃথিবীতে গান্ধিজি ব্যক্তির আত্মোৎসর্গকেই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ বলে নির্ণয় করেছিলেন। হিরোসিমা নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণের পরে তিনি পৃথিবীবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। মানব সভ্যতার এমন বিপর্যয় এড়াতে এই গ্রন্থের সন্ততিদের অহিংসাকে গ্রহণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই। বিশ্ববাসী যদি অহিংসাকে মান্যতা না দেয়, তবে মানব সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে আত্মহত্যার অনিবার্য পথ খনন করা। রোঁম্যা রোঁল্যা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

“Non-violence has come to men, and it will remain. It is the annunciation of peace on earth.”<sup>3</sup>

একথা ঠিক, অহিংসাই হবে সেই শান্তির বার্তা। মানুষ অবতার রূপে পরিগণিত হয়, মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধের পরিচয়ে। রোঁম্যা রোঁল্যা তাঁর গ্রন্থটি শেষ করেছেন এভাবে –

“This is Gandhi’s message.... In a mortal half-god the perfect incarnation of the principle of life which will lead a new humanity on to a new path.”<sup>8</sup>

১৯২৪ সালে গ্রেট ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত রোঁম্যা রোঁল্যার লিখিত ‘Mahatma Gandhi’ - গ্রন্থটি পাঠ করে ম্যাডেলিন স্লেডের ভাবান্তর ঘটে গেল। রোঁল্যা তাঁকে বোঝালেন গান্ধি হলেন সেই ভারতীয় ঋষি, যাঁকে তুলনা করা যায়, মানব শ্রেষ্ঠ তথা মানব প্রেমের বার্তাবাহক যীশুর সঙ্গে। জীবনের মোড়টা কেমন সুতো কাটা ঘুড়ির মত অভিজাত ইংরেজ জীবনকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল ম্যাডেলিনের। রোঁম্যা রোঁল্যা গান্ধিকে বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপেই চিহ্নিত করেছেন। ম্যাডেলিন লিখেছেন –

“I could not put it down ... From that moment I knew that my life was dedicated to Gandhi.”<sup>৫</sup>

ঠিক তাই। এই বিদেশিনি তরুণী রোঁল্যার লেখা গ্রন্থটিকে নামিয়ে রাখতে পারেননি। সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি তাঁর জীবন গান্ধিকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। সব রকমের আমিষ খাদ্য বর্জন করে নিরামিষ আহার করেছেন। মদ ও মাংস আহার পরিত্যাগ করেছেন। সে ছিল এক তপস্বী জীবনের সত্যিকারের প্রশিক্ষণ পর্ব। তিনি গীতা পাঠ করেছেন। ফরাসী ভাষায় ঋগ্বেদের মন্ত্র পাঠ করেছেন। উলবোনা শিখেছেন। ইউরোপীয় আধুনিক এই নারী হয়ে উঠেছেন যথার্থ ভারতকন্যা।

## দুই

“Buddha preached renunciation, and India heard. Yet within a thousand years she had reached her highest point of national prosperity. The national life in India has renunciation as its source. Its highest ideals are service and Mukti. The Hindu mother eats last. Marriage is not for individual happiness, but for the welfare of the nation and the caste.”<sup>৬</sup>

– একথা লিখেছেন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ‘Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda’ নামক গ্রন্থে। গুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যা নিবেদিতা আলমোড়া, নৈনিতাল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। কাশ্মীরের বিতস্তা নদীতীরে ২০ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত তাঁরা সেখানে ছিলেন। নিবেদিতা লিখেছেন, ভগবান বুদ্ধের ত্যাগের কথা বলেছেন। এই ভারতবর্ষ সে কথা শুনেছে। হাজার বছরের মধ্যে ভারতের সম্পদ উন্নতির শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছে। ভারতের জাতীয় জীবনের উৎস হল ত্যাগ। সেবা এবং মুক্তি তাঁর উচ্চতর আদর্শ। হিন্দু রমণী খাদ্য গ্রহণ করেন সকলের আহারের শেষে। বিবাহ ব্যক্তিগত সুখ নয়। সমস্ত জাতি এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এর মধ্যে।

কোন বিদেশিনির পক্ষে ভারতকন্যার গৌরব অর্জন সহজ নয়। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর সেবায় তিনি আপনার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মধারাকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে–

১. দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা।

২. প্লেগ-মহামারি, বন্যা এবং জাতীয় বিপর্যয়ে সেবা। এছাড়া বিপন্ন মানুষের জন্য ত্রাণকার্য।



৩. নারী সমাজের উন্নতির জন্য মহতী কর্তব্য কর্ম।
৪. জাতীয় শিক্ষায় তাঁর সমর্থন ও অংশগ্রহণ।
৫. ভারতীয়দের ঘুমন্ত জাতিসত্তাকে জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা।
৬. জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ভারতীয়বোধ ও স্বদেশপ্রেম।
৭. ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধনায় অনলস অবদান।
৮. স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নসন্ধানী আদর্শবোধের রূপায়ণ।
৯. গ্রন্থ রচনায় মহতী জীবনাদর্শের প্রতিফলন।

নিবেদিতা এদেশে এসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অসম ভারতবর্ষের বৈপরীত্যের ছবি। ১৮৯৮ সালে তিনি কলকাতায় বাগবাজার অঞ্চলে স্কুল স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বাস করলেন। প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি পতিত হয়েছিল নিকটবর্তী দারিদ্র্যজর্জর মানুষের প্রতি। তিনি দেখেছিলেন উচ্চবর্গীয় ভদ্র শিক্ষিত লোকেদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। পাশাপাশি তিনি দেখেছেন, দরিদ্র মানুষেরা ছোট ছোট মাটির কুঁড়ে বাড়িতে বাস করছেন। এই ছবিই তাঁকে প্রাণিত করেছিল দরিদ্র মানুষের জন্য সেবাকর্মে আপন জীবন উৎসর্গ করার। তাছাড়া ভারতবর্ষের সেবা করার জন্য স্বামীজি নিবেদিতার প্রতি উদ্দীপিত প্রেরণা বার্তা পাঠিয়েছেন। ২৯ জুলাই, ১৮৯৭ সালে আলমোড়া থেকে প্রেরিত একটি চিঠিতে স্বামীজি লিখেছেন, ভারতের কাজে নিবেদিতার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য তো বটেই, বিশেষত ভারতের নারীজাতির প্রয়োজনে। পুরুষের চেয়ে তেমনই এক নারীর প্রয়োজন। একজন যথার্থ সিংহীর প্রয়োজন। নিবেদিতা হলেন সেই সিংহী, যাঁর রয়েছে প্রকৃত শিক্ষা ও ঐকান্তিকতা। পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা ও দৃঢ়তা। বিবেকানন্দ তাঁর কল্যাণীয়া মিস নোবেলকে লিখলেন –

“I am now convinced that you have a great future in the work for India. What was wanted was not a man, but a woman - a real lioness – to work for the Indians, women specially. ... Your education, sincerity, purity, immense love, determination, and above all, the Celtic blood make you just the woman wanted.”<sup>9</sup>

ঐ চিঠিতে বিবেকানন্দ তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে খোলাখুলিই লিখেছেন, এদেশে কাজ করার অজস্র বাধা বিঘ্নের কথা। ব্যাধি পীড়িত, দারিদ্র্য জর্জর এই দেশ। এখানে আছে দুঃখ, কুসংস্কার ও দাসত্বের প্রখরতা, যা ধারনারও বাইরে। লিখেছেন, এখানে এলে তুমি দেখবে, অর্ধনগ্ন অসংখ্য নরনারী। জাতিগত অস্পৃশ্যতার বেড়া জালে তারা আবদ্ধ-

“Yet the difficulties are many. You cannot form any idea of misery, the superstition, and the slavery that are here. You will be in the midst of a mass of half-naked men and women with quaint ideas of caste and isolation.”<sup>10</sup>

স্বামীজি নিবেদিতাকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য কাজ করতে বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ব্যক্তিকে খাঁটি হিন্দু পরিচয়ের উর্দে উঠে কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। ক্ষুদ্র গণ্ডির পরিচয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখা চলে না। কেননা, আমাদের প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে। নিবেদিতা সে কথা বুঝেছিলেন। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে বিউবোনিক প্লেগের আবির্ভাব ঘটল। ঐ অঞ্চলে দ্রুত গতিতে প্লেগ বিস্তার লাভ করল। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে প্লেগ কমিটি তৈরি করলেন। নিবেদিতা হলেন সেই কমিটির সেক্রেটারি। কয়েকজন সন্ন্যাসী প্লেগ কমিটির সদস্য হলেন। নিবেদিতা সর্বশক্তি দিয়ে প্লেগ প্রতিরোধের কাজে বাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানালেন প্লেগ প্রতিরোধের জন্য। ছাত্র এবং যুবশক্তির কাছে নিবেদিতার উদাও আহ্বান পৌঁছাল। তাদের থেকে ভাল সাড়া মিলল। তারা প্লেগ প্রতিরোধের জন্য কমিটির কাছে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করলেন। অবাধ হতে হয়, নিবেদিতা নিজের হাতে রোগীর ঘর পরিষ্কার করেছেন, অপরিচ্ছন্ন রাস্তা পরিষ্কার করেছেন। বাড়ি বাড়ি নিজে গিয়ে রোগীর অবস্থা তদারক করেছেন। সর্বোপরি নিজের হাতে রোগীর সেবা করেছেন। বাগবাজার সংলগ্ন বস্তিতে ঘুরে ঘুরে রোগীর যত্ন নিতে যেন তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। নিবেদিতার সেবার কোন তুলনা হয় না। দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত। তাঁর সেবাকার্য চলতেই থাকে। তাঁর অন্তহীন শ্রম-সেবায় রোগগ্রস্ত বালক সুস্থ হয়ে উঠেছিল। বেলুড় মঠ থেকে স্বামীজি তাঁর প্রিয় রাজার (Swami Brahmananda) উদ্দেশ্যে শুক্রবার ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে এক চিঠিতে লিখেছেন –



“Please pay 100 Rs. to Sister Nivedita immediately for plague work and credit it to a separate plague account.”<sup>5b</sup>

বেলুড়ে গঙ্গাতীরের ছোট বাড়িতে ১৮৯৮ সালের মার্চ থেকে ১১ই মে পর্যন্ত নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দ, ধীরামাতা প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ অবস্থান করেছিলেন। নিবেদিতা ও স্বামীজি মহামারি দূর করার জন্য যে জনসেবামূলক কাজের প্রচেষ্টা করেছিলেন, তার ফলে সাধারণ মানুষের মন থেকে প্লেগের আতঙ্ক দূর হয়েছিল। নিবেদিতা তাঁর ‘Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda’ – গ্রন্থের (Chapter-I, The House on the Ganges) অধ্যায়ের শেষাংশে মহামারি প্রসঙ্গে লিখেছেন, মহামারি দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা জনসাধারণকে সাহস যুগিয়েছেন। মহামারির এমন কঠিন সময়ে স্বামীজি কলকাতা পরিত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু মহামারির সংকট অতিক্রান্ত হলে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি আরও লিখেছেন – প্লেগ ঝড়ের গতিতে বিস্তার লাভ করছিল। রোগের ভীষণ মূর্তি বাংলার আকাশ বাতাসকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছিল –

“Another week and he (Swami Vivekananda) was gone to Darjeeling; and till the day that the plague declaration brought him back, we saw him again no more ... Plague, panic and riot were doing their fell work ... He (Swami Vivekananda) had come back and the old life was resumed once more, as far as could be, seeing that an epidemic was in prospect and that measures were on hand to give the people confidence. As long as this possibility darkened the horizon, he would not leave Calcutta.”<sup>5c</sup>

মহামারির সময়ে স্বামীজি প্লেগ প্রতিরোধের জন্য ‘The plague Manifesto’ তৈরি করেছিলেন। কলকাতাবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, এই রোগকে খুব সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। ভীতি দূর করো। রোগের বিরুদ্ধে ঝাঁপাও। পরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করো। ঘরদোর, জামাকাপড়, বিছানাপত্র, নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখো। নষ্ট খাবার খেতে তিনি মানা করেছেন। দুর্বল শরীরে রোগ আক্রমণের প্রকোপ বাড়ে। সুতরাং বিশুদ্ধ এবং পুষ্টিকর খাদ্য আহারের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ইচ্ছে অনুযায়ী টিকা নেওয়ার কথাও বলেছেন তিনি–

A. Always keep the house and its premises, the rooms, clothes, bed, drain, etc., clean.

B. Do not eat stale, spoiled food, take fresh and nutritious food instead. A weak body is more susceptible to disease.

... g. Only those who are willing will be vaccinated. ... The Mother is assuring us: “Fear not! Fear not!”<sup>5d</sup>

পথ প্রদর্শক গুরুর দেখানো পথেই নিবেদিতা জীবন বাজি রেখে কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

গুরুর আদর্শ নিবেদিতাকে যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। স্বামীজির মৃত্যুর পরে ১৯০৭ সালের ৪ঠা জুলাই নিবেদিতা তাঁর ‘Our Master and his message’ নামক ‘ভূমিকা’য় (Introduction) লিখেছেন, কর্ম কখনোই জ্ঞান ও ভক্তি থেকে পৃথক নয়। কর্মক্ষেত্র ও পাঠকক্ষ, ক্ষেত্র-খামার – সাধুর উপাসনা স্থানও মন্দিরের দরজার মতই সত্য। এগুলি সবই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনের উপযুক্ত স্থান। মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন পার্থক্য নেই। ঠিক তেমনি পার্থক্য নেই সদাচার ও আধ্যাত্মিকতার পারস্পরিকতায়,

“... The great preacher of Karma, not as divorced from, but as expressing Jnana and Bhakti. To him, the workshop, the study, the farmyard, and the field are as true and fit scenes for the meeting of God with man as the cell of the monk or the door of the temple. To him, there is no difference between service of man and worship of God, between manliness and faith, between true righteousness and spirituality.”<sup>5e</sup>

১৯০৬ সালে পূর্ববঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং জলোচ্ছ্বাসের কারণে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। একদল সন্ন্যাসী ত্রাণের কাজে বন্যা দুর্গত এলাকায় গিয়েছিলেন। নিবেদিতা অপেক্ষা না করে পূর্ববঙ্গে পৌঁছিলেন। তালগাছের তৈরি ছোট ছোট ভেলা নৌকায় প্লাবিত ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করে মাটির বিধ্বস্ত বাড়িগুলি তিনি পরিদর্শন করেছিলেন। অসহায় পীড়িত নরনারীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর ‘Glimpses of Famine and Flood in East Bengal in 1906’ (printed at the Indian press, 1907) গ্রন্থে সে সময়ের নিদারুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন –



“... to be eleven hundred thousand persons, all in the same district, who have not had a sufficient meal for months, and who even now are wholly dependent, for what they expect to eat, on a precarious charity.”<sup>25</sup>

সেবা অন্ত-প্রাণ, কর্মমুখর এই বিদেশিনি সেই সেদিনের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস জর্জর ভারতবর্ষে দীপশিখাধারিণী পুণ্যবতী রমণীর আদর্শ নিয়ে সত্য সত্যই ভারতকন্যা হয়ে উঠেছিলেন। সিস্টার নিবেদিতা। ভারতীয় নারী সমাজের উন্নতিবিধানের জন্য তাঁর প্রাণান্তকর চেষ্টার কোন অন্ত ছিল না। একথা ঠিক, আমেরিকা ও ইউরোপের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত রমণীদের ভারতীয় নারী-পুরুষের অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার সম্পর্কে ধারণা যে ছিল না, তা নয়। তবুও পাশ্চাত্য রমণী মিসেস বুল (ধীরামাতা) যখন ভারতবর্ষে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেন, তখন সেকথা জেনে ১৯৯৭ সালের ১৯শে আগস্ট স্বামীজি আম্বালা (Ambala) থেকে গুঁর উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটিতে স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে বেলেড় মঠের নাম ছিল। স্বামীজি লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষ হল পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। বড় শহর ছাড়া এখানে ইউরোপীয় জীবনচর্যার স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় কোথাও নেই -

“I, of course, will be very glad to see you in India, only you ought to know from the first that India is the dirtiest and unhealthiest hole in the world, with scarcely any European Comforts except in the big capitals.”<sup>28</sup>

স্বামীজি একথা জানালেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতে এসেছিলেন আমাদের তিনজন (‘all three’<sup>26</sup>)। এই তিনজন হলেন যথাক্রমে মিস ম্যাকলাউড (জয়া), মিসেস বুল (ধীরামাতা) এবং মার্গারেট নোবেল (নিবেদিতা)। মিস মার্গারেট নোবেল দীক্ষা গ্রহণ করেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ। দীক্ষান্তে তাঁর পরিবর্তিত নাম হয় ‘নিবেদিতা’। ইনিই স্বামীজির মানস কন্যা। ভগিনী নিবেদিতা নামে তিনি ভারতবাসীর কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ভারতীয় নারীর সামাজিক এবং শিক্ষার দায়দায়িত্ব পালনের গুরুত্বপূর্ণ ভারটি স্বামীজি তাঁর উপরই অর্পণ করেছিলেন। ভারতীয় নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য নিবেদিতার সংকল্প ও কাজ অনেক। তাঁর বিভিন্ন রচনা এবং বক্তৃতায় এদেশের নারীর অসহায়তার দিকগুলি তুলে ধরেছেন। এগুলির মধ্যে সহমরণ প্রথা, ডাইনি দহন, বালবিধবাদের অমানবিক অবস্থা প্রভৃতি। সতীদাহকে বন্ধ করার চেষ্টা হিন্দু জনসাধারণের ছিল না। এমনকি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অনুশাসনের কারণে চিতার আগুনে পুড়ে যাওয়া অনুমৃত্য রমণীকে সাধ্বী রমণী বলে দেবীত্বের মহিমা আরোপ করা হত। কখনো কখনো এমন মৃত্যুকে গৌরবান্বিত করার জন্য অনুমৃত্য রমণীর স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করা হত। বিবেকানন্দের স্নেহে প্ররোচিত নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন, অতীত ভারতবর্ষ থেকে সমকালীন ভারতবর্ষের নারীর সত্যকার বাস্তব অবস্থা। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিবেদিতা বুঝেছিলেন। স্বামীজি ছিলেন তাঁর আদর্শ শিক্ষক। স্বামীজি তাঁর ‘Education of Women’ নামের এক বক্তৃতায় বলেছেন -

“Every man must so discipline his mind as to bring himself to regard all women as his sisters or mothers. Women must have freedom to read, to receive as good an education as men. Individual development is impossible with ignorance and slavery.”<sup>27</sup>

সে সময় আমেরিকার একটি সংবাদপত্রে স্বামীজিকে ‘Indian Social Reformer’ (June 16, 1901) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ‘Hindu Widows’ নামে স্বামীজি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেই বক্তব্যের মূল্যায়ন স্বরূপ পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিল -

“He emphasised his desire for the education and elevation of the women of his Country, including the widows.”<sup>29</sup>

নিবেদিতা বুঝেছিলেন, নারীর সামাজিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ মাপক একক। বিবেকানন্দের মুখ নিঃসৃত বাণী তিনি ভোলেন নি। অন্তঃপুর বাঙালি রমণীর শিক্ষা বিস্তারের জন্যই যেন তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য উত্তর কলকাতার বাগবাজারে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। স্বামীজির মহত্তর প্রেরণার ফল ছিল এমন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। একথা ঠিক, নারীর শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনেই স্বামীজির প্রয়োজন ছিল নিবেদিতাকে। নিবেদিতার মহতী পরিকল্পনার কথা জানা যাচ্ছে একটি লেখায় -

“Only in one respect was he (Swami Vivekananda) inflexible. The work for the education of Indian women, to which he would give his name, might be as sectarian as I chose to make it.”<sup>2b</sup>

নিবেদিতা বলরাম বসুর বাড়িতে আয়োজিত একটি সভায় বালিকা বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সভাসদদের উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে বলেছিলেন, তাঁরা যেন মেয়েদের উৎসাহিত করে পড়াশুনার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান। নারী শিক্ষার উন্নতির জন্য সকলের উদ্দেশ্যে তিনি কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সভায় উপস্থিত কেউ কেউ প্রতিশ্রুতি দিলেও, অনেকেই তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেননি। বিদ্যালয় চালু হল। বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে সারদাদেবী সেই ১৬ বোসপাড়া লেনে কালীপুজোর দিনে বিদ্যালয়টি উদ্বোধন করলেন। সে সময় অনেক পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে রাজি ছিলেন না। তবুও অনেকেই বিদ্যালয়ে এলেন। কিছু বিধবা রমণী এবং প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলারাও এলেন। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য নিবেদিতা কষ্ট করে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাঁর বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ছাড়াও ছাত্রীদের হাতের কাজ, নিয়মানুবর্তিতা এবং হাতে কলমে সেবামূলক (নার্সিং) বিষয়ক শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ভারতে আসার পরে নিবেদিতা এদেশের সংস্কৃতিকে একান্ত আপনার করে নিয়েছিলেন। এদেশে এসে ভারতীয় সমাজ, বিশেষত হিন্দুধর্মের রীতিনীতি, ধর্ম-দর্শন, মোক্ষ-মুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। অনেকক্ষেত্রে সমাজে শেকড়-নিবন্ধ কুসংস্কারগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করতে তৎপর হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মৌল প্রাণপ্রেরণার স্বরূপ যথাযথভাবে বুঝেছিলেন। ভারতীয় শীর্ষস্থানীয় বাঙালি বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। আচার্য বসুর বৈজ্ঞানিক সাফল্যের পেছনে নিবেদিতার অবদানকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ক্রমে ক্রমে নিবেদিতা ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ তিনি বুঝেছিলেন। বিভিন্ন সভায় ভারতীয় ধর্মবোধ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন। ভারতীয় জাতির জাতীয়তাবোধের প্রতি তিনি গভীর সম্মান পোষণ করতেন। স্বামীজির ভাবদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ভারতবর্ষের সুবিপুল যুবসমাজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি বুঝেছেন, এদেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভ জরুরি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিবেদিতার বহুমুখী কর্মপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ দিক নিশ্চয়ই। তিনি বাংলার বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, নিবেদিতা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করেছেন। সে সময়ের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দকুমার স্বামী এবং ই বি হ্যাভেলের মতো শিল্পীদের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি তাঁদের একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পচর্চার স্কুল খুলতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্রদের ভারতীয় জাতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে উপদেশ দিয়েছেন। এমন কি, তিনি মহিলাদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। নিবেদিতা ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সঞ্চার করতে সদা তৎপর ছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতটি প্রার্থনা মন্ত্র হিসেবে গাওয়ার প্রচলন করেছিলেন। নিবেদিতা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার অরবিন্দ ঘোষের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সেই সেকালে শ্রীঅরবিন্দের ‘কর্মযোগিন’ পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করেন। ভারতবর্ষ যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধিক সার্বভৌম দেশ, সেকথা নিবেদিতা তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় উল্লেখ করেছিলেন। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় জনিত কারণে উত্তরকালে আমরা সেজন্য সকলে গর্ববোধ করি নিশ্চয়ই।

নিবেদিতাকে ভারতবাসী বিশেষত বাঙালিরা ভোলে নি। এই মহীয়সী মহিলার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতমাতার ছবি আঁকেন। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার তাঁর স্মৃতিতে একটি পোস্টাল স্ট্যাম্পের প্রচলন করেন। অধুনা ২০১০ সালে সল্টলেক সিটিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের অফিসের নামকরণ করেছেন নিবেদিতা ভবন। ২০১৫ সালে আলিপুরে একটি সরকারী কলেজের নাম তাঁর নামেই রাখা হয়েছে। ২০১৮ সালে বরানগর রামকৃষ্ণ



মিশন পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ভবনটির নাম ‘নিবেদিতা ভবন’ রাখা হয়েছে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিবেদিতার নামাঙ্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

নিবেদিতা সেই বিদেশিনি শ্বেতাঙ্গিনী তরুণী যিনি ভারতবর্ষের গরিবগুর্বো অন্ত্যজ মানুষজনকে ভালোবেসেছিলেন। তাদের আপন করে নিয়েছিলেন। কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ফিরেও তিনি ছিলেন অক্লান্ত। ভারতবর্ষের নিম্নবর্ণীয় মানুষের সংস্পর্শেও তাঁর রক্ত কলুষিত হয়নি। বরং পবিত্র হয়েছে। আদর্শ নরনারী প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যে উক্তি নিবেদিতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সে কথা যেন স্বয়ং তাঁর সম্পর্কেই বেশি করে খাটে। নিবেদিতা তাঁর ‘Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda’ (chapter XI) - গ্রন্থে লিখেছেন, ভারতবর্ষের প্রকৃত অভাব কার্যকুশলতা। কিন্তু তাঁর জন্য ভারতবর্ষ যেন সেই পুরাতনী চিন্তাশীল জীবনের উপর তার অধিকার ছেড়ে না দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সমুদ্রের মতো গভীর, আর আকাশের মতো উদার হওয়াই বাঞ্ছনীয় -

“India wanted practicality, but she must never let go her hold on the old meditative life for that.  
“To be as deep as the ocean and as broad as the sky,” Shri Ramakrishna has said, was the ideal.”<sup>20</sup>

ভারততীরে নিবেদিতা সত্য সত্যই সুবিশাল সমুদ্রের মত গভীর আর উন্মুক্ত আকাশের মত উদার। তাঁর তুলনা কেবল তিনিই।

### তিন

গীতার অনুশীলন পর্ব। অভ্যাসযোগ। ভগবান কৃষ্ণ গীতার কর্মযোগ প্রসঙ্গে শুনিয়েছেন, ধর্মযুদ্ধে কোন অন্যায় নেই। ধর্মকে অবশ্যকর্তব্য বিবেচনা করে কর্ম করলে সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় বড় হয় না। কর্তব্য কর্মের মধ্যেই রয়েছে আনন্দ। অতএব যুদ্ধের সংকল্পে স্থির হয়ে অনুশীলন করো। যুদ্ধ জয়ে রাজ্যপ্রাপ্তি, পরাজয়ে স্বর্গলাভ। অতএব কর্তব্য জ্ঞানে যুদ্ধ করার জন্য সজ্জিত হতে হবে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে-

“সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ  
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাস্প্যসি।”<sup>20</sup>

ম্যাডেলিন স্লেড (মীরাবেন)। ভারতবর্ষ তখন যুদ্ধক্ষেত্র। কেবল এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়। অজস্র কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস শেকড় গেড়ে রয়েছে এদেশের মাটিতে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আশ্রিত, শতাব্দী পীড়িত লজ্জা ও গ্লানি ভর করে আছে এদেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগর থেকে বন্দরের আনাচে কানাচে। স্লেড এলেন ও জয় করলেন এমন কিছু নয়। গীতার অভ্যাসযোগের প্রস্তুতি পর্বের কথা মনে পড়ে। কঠিন সংগ্রামের পূর্বে যোদ্ধাকে তপস্যা শাসিত সাধনার অনুশীলন করতে হয়। গান্ধিজির অহিংস সত্যগ্রহ ছিল এক যথার্থ ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী তাপসের সুকঠিন সাধনা। অহিংসা সংগ্রামের মহতী অস্ত্র হতে পারে, গান্ধিই তা পৃথিবীবাসীকে শুনিয়েছিলেন। তাঁর জন্য তিনি দুঃস্বপ্ন তপস্যার মাধ্যমে আত্মশক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। ম্যাডেলিনের ভারতযাত্রার প্রস্তুতি পর্ব ছিল অভ্যাসযোগের অনুশীলন। তিনি নিরামিষ আহারবিহারী হয়ে উঠলেন। মদ্যপান বর্জন করলেন। মাটি ছুঁয়ে উবু হয়ে বসা অভ্যাস করলেন। সর্বোপরি মেঝেতে ঘুমানো অভ্যাস করলেন। আর গান্ধিজির প্রকাশিত ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ (‘Young India’) - এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি কিনে তিনি পড়তে শুরু করলেন। ইংরেজিতে লেখা এই পত্রিকাটি গান্ধিজি ১৯১৯ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। জানা যাচ্ছে, মীরাবেন পত্রিকাটির প্রায় শতাধিক রচনা পড়েছিলেন। তাঁর এমন শিক্ষানবিশি সময়ের অনেকটাই প্যারিসে অতিবাহিত হয়েছিল। এখানে তিনি ফরাসী ভাষায় অনুদিত ঋগ্বেদ এবং শ্রীমদভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করেছিলেন।

প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফিরলেন ম্যাডেলিন স্লেড। মহাত্মা গান্ধির আহ্বান তাঁর অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করেছিল। গান্ধি তখন হিন্দু-মুসলমানের স্বপ্ন সন্ধানী ঐক্যের জন্য কাজ করছিলেন। ম্যাডেলিন গান্ধির আদর্শ সম্পর্কে জেনেছিলেন, গভীর উপলব্ধি তাঁর মানস জগৎ আচ্ছন্ন করেছিল। তিনি তাঁর ‘The spirit’s pilgrimage’ - গ্রন্থে গান্ধির লেখা কবিত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন -

“Bapu now wrote a long article for ‘Young India’ entitled “The Fiery Ordeal” describing the incident and giving his reasoning’ for the step he had taken. He reinforced his argument with two poetic Quotations most characteristic of his attitude toward life:





“The pathway of love is the ordeal of fire,  
The shonkers turn away from it  
The way of the Lord is meant for heroes,  
Not for cowards.”<sup>22</sup>

একথা ঠিক, প্রেমের পথ সৃষ্টির ঝরা ঝরা আঙুনে নির্মিত। ভগবানের সৃষ্ট এ পথ কাপুরুষের জন্য নয়। ম্যাডেলিন স্লেড নিজেকে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর ভাগ্যের সঙ্গে কখন, কেন কোন অজান্তে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তা কেবল বিধাতা পুরুষই বলতে পারেন। ১৯২৫ সালের ২৫শে অক্টোবর ম্যাডেলিন ইংল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে যাত্রা করেছিলেন। ৬ই নভেম্বর জাহাজ বোম্বাই বন্দরে নোঙর ফেলে। মহাত্মা গান্ধির পুত্র দেবদাস গান্ধি এবং অন্যান্য গান্ধি অনুগামী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কোনরকম দেরি না করে ম্যাডেলিন আশ্রমে ফিরতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ট্রেনে করেই আমেদাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ভারতকন্যা মীরাবেন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

“On November 6<sup>th</sup> the ship came alongside the dock in Bombay. As had been promised, friends were there to meet me ... In the afternoon, Devadas Gandhi, Mahatma Gandhi’s fourth and youngest son, came in and he too pressed me to stay, but, seeing my determination to go on at once, he finally arranged for my departure by the Ahmedabad train that night. The train steamed into the Ahmedabad station next morning, November 7<sup>th</sup>, exactly on time.”<sup>22</sup>

ট্রেন থামল। মীরাবেন পা রাখলেন তাঁর সাধের তীর্থক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে। স্টেশনে তখন উপস্থিত মহাদেব দেশাই, বল্লভভাই প্যাটেল এবং স্বামী আনন্দ প্রমুখ। ছোট খাটো আঁকা বাঁকা পথে এই বিদেশিনি তরুণী আশ্রমে পৌঁছলেন। দেখলেন ভারতবর্ষের খ্রীষ্ট ঋষি তাপস মহাত্মাজিকে। সেই প্রথম সাক্ষাৎ। কোথা থেকে ভেসে এল সেই ঋণাধারার মত পিতার পবিত্র আস্থান – তুমি আমার মেয়ে হবে। ম্যাডেলিনের অন্তরাঘ্না ছুঁয়ে যায়। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

“As I entered, a slight brown figure rose up and came toward me. I was conscious of nothing but a sence of light. I fell on my knees Hands gently raised me up, and a voice said “You shall be my daughter.” My consciousness of the physical world began to return, and I saw a face smiling at me with eyes full of love, blended with a gentle twinkle of amusement. Yes, this was Mahatma Gandhi, and I had arrived.”<sup>23</sup>

তখনও ম্যাডেলিন স্লেড আদর্শ ভারতীয় কন্যা হয়ে ওঠেননি। কিন্তু তিনি তপস্যা করেছেন। আমৃত্যু তাঁর তপস্চর্যা। আশ্রমে গান্ধিজি তাঁকে চরকায় সুতো কাটা শিখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আশ্রমে তিনি রান্না করেছেন। এমন কি শৌচাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতেন। আরও কত কি? তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

“Bapu said I was to learn carding and spinning of cotton ... The Ashram in the daily sweeping of the Ashram latrines. The hours of rising, prayer, work and returning to rest at night were also explained to me, and I saw that I had not been mistaken when I had anticipated a busy life of hard work.”<sup>24</sup>

শুধু তাই নয়, বড় ব্যস্ত জীবন ছিল তাঁর। নিয়মিত প্রার্থনা করতেন তিনি। তিনি হিন্দি ও উর্দুর মিশ্রণজাত ভাষা হিন্দুস্থানী শিখেছিলেন। কিন্তু গান্ধিজি তাঁকে ইংরেজিতেই সম্বোধন করতেন। গান্ধির সুবিখ্যাত আত্মজীবনীটি ‘The Story of My Experiments with Truth An Autobiography’ – গ্রন্থটি আমাদের সকলেরই জানা। এই গ্রন্থটির ভাষা, ব্যাকরণগত সংশোধন ও মার্জনার ভার গান্ধি তাঁকে দিয়েছিলেন। এ কাজ দক্ষতার সঙ্গে শেষ করেছিলেন তিনি। তিনি তাঁর ‘The spirit’s Pilgrimage’ – গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করে লিখেছেন –

“One more job now came my way once a week. It was not lengthy but most interesting Bapu had begun his autobiography Experiments with Truth. ... Before going to press it used to come to me for any corrections in English. No metter what other work I might be doing. I had to put it aside when the manuscript came into my hands each week, as there was usually no margin of time left”.<sup>25</sup>

গান্ধির পরামর্শে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ ম্যাডেলিন উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত ভ্রমণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সবরমতী আশ্রমে ফেরার পর তিনি ব্রহ্মচারী হতে চাইলেন এবং তিনি সাদা শাড়ি পড়া শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রহ্মচর্য ব্রত নেন। আর চুল ছোটো করে ছেটে ফেলেন। ভারতবর্ষের গ্রাম জীবনের সঙ্গে তাঁর এই সময় পরিচয়



ঘটে। তিনি হিন্দুস্থানী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেন। ভারতবর্ষের অরণ্যকেন্দ্রিক গ্রামজীবনের সরলতা, গাছপালা পশুপাখি তাঁর কাছে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর ‘The spirit’s Pilgrimage’ – গ্রন্থে লিখেছেন –

“I began to make better progress with my Hindustani, and I also started going to a nearby village to teach carding to the inhabitants. This was my first contact with Indian villagers. At the same time the path to and fro passed through a part of the real Jungle, with a small stream to ford at one place. Here were trees to make friends with and birds to greet. It was good.”<sup>২৬</sup>

ম্যাডেলিন স্লেড আর ইংরেজ কন্যা নন। এই ভারতবর্ষে তাঁর নতুন জন্ম হল। পিতৃ প্রদত্ত উত্তরাধিকার ও নাম পরিচয় তিনি মুছে ফেলতে চাইলেন। এরপর ভারতবর্ষের বুক থেকে অনেক জল গড়িয়ে গেল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। গান্ধিজিকে হত্যা করা হল। তারও অনেক অনেক কাল পরে, ১৯৮২ সালে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর নাম মীরাবেন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন, হ্যাঁ এটাই আমার নাম। যদি কেউ আমাকে ‘মিস স্লেড’ বলে বলেন, আমি বলব আমি জানি না, কার সঙ্গে তাঁরা কথা বলছেন –

“It is my name. If someone says ‘Miss Slade’ to me, I don’t know who they are talking to.”<sup>২৭</sup>

ওয়ার্থা আশ্রমে অবস্থানকালে প্রবল ম্যালেরিয়া পীড়ায় মীরাবেন খুব ভুগেছিলেন। তাঁর ১০৫ ডিগ্রি জ্বর উঠেছিল। এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। তিনি তখন খুব দুর্বল। গান্ধিজি তাঁকে পুনেতে বিশ্রামের জন্য পাঠালেন। বায়ু পরিবর্তনের ফলে তিনি সুস্থ হলেন। মীরাবেন গান্ধির খাদি আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়লেন। আর আশ্রমে বয়ন শিল্প সংক্রান্ত নানা কাজে সারাটিক্ষণ তিনি লেগে থাকতেন। এগুলির মধ্যে তুলো পেঁজা, চরকা চালানো আর আশ্রমের বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতবর্ষে আসার পরপরই মীরাবেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর আগমনকাল ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় গান্ধিযুগ। দুস্থ নরনারীর সাহায্যার্থে গান্ধিজির পরামর্শে তিনি কখনো কখনো অর্থ সংগ্রহের কাজে নেমে পড়তেন।

এরপর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রস্তাব পাশ করে। ১৯৩১ সালে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে (Round Table Conference) মীরাবেন মহাত্মা গান্ধির সহযোগী রূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩২-১৯৩৩ সালে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছিল। সে সময় আমেরিকা এবং ইউরোপে তথ্য সরবরাহের অভিযোগে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। এরপর ১৯৪২ সালে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। পুনের আগা খান প্যালেসে গান্ধিজি এবং তাঁর পত্নী কস্তুরদেবীর সঙ্গে তিনিও বন্দীদশা যাপন করেছেন। মীরাবেন তাঁর ‘The Spirit’s pilgrimage’ - গ্রন্থে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রভৃতি নানা তথ্যের প্রাজ্ঞল বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থটিকে তাঁর লেখা বিশিষ্ট আত্মজীবনী গ্রন্থের মর্যাদা দিলে কোন অত্যাধিক্য হবে না। গ্রন্থের কোন স্থানে তিনি লিখেছেন যে, তিনি পল্লি-রমণীদের সাহায্য করছেন। কাপড়, সুতো প্রভৃতির বিনিময়ে তাদের অর্থ সংগ্রহের কাজে সেই শহায়তা (পৃ. ১০১), কোথাও বিহারের ম্যালেরিয়া পীড়িত গ্রামের ছবি (পৃ. ১০৩), কোথাও তাঁর প্রিয় বাপুর লেখা গীতার ভূমিকার অনুবাদের উল্লেখ করছেন তিনি (পৃ. ১০৩)। কোন স্থানে তিনি লিখেছেন, বাপুর ব্যক্তিগত জীবন যাপন, নিয়মানুবর্তিতা এবং সময় তালিকায় লক্ষ্য রাখাই তাঁর কাজ (পৃ. ১০৪)। কোথাও তিনি মিটিংয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ করছেন। কোথাও লিখেছেন, পরাধীন ভারতবর্ষে ২৬শে জানুয়ারী সবারমতী আশ্রমে ভারতের প্রতীকী স্বাধীনতা দিবস পালনের অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণের কথা (পৃ. ১০৮)। কোথাও লিখেছেন, সত্যগ্রহীদের লবণ আইন ভঙ্গের কথা (পৃ. ১০৯)। গ্রন্থের কোন স্থানে রয়েছে, ৫ই এপ্রিল গান্ধির ডাঙি অভিযানের কথা এবং সত্যগ্রহী নরনারীদের গ্রেফতারের কথা। অবশেষে গান্ধিকেও গ্রেফতার করা হল। তাঁকে য়ারাব্দা (Yaravda) জেলে স্থানান্তরিত করা হল (পৃ. ১১২)। স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা ঘটনায় টাইটস্বর তাঁর রচনা। এছাড়া ভাষা শিক্ষার জন্য বাপুজি তাঁকে কন্যাগুরুকুলে পাঠিয়েছিলেন। অবশেষে পাঠিয়েছিলেন পাঠিয়েছিলেন ভগবদ্ভক্তি আশ্রমে। সে কথারও উল্লেখ করেছেন তিনি (পৃ. ৯৫)। গান্ধি অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। সে সময়ে আর এক জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ড. আম্বেদকর। মীরাবেন তাঁর উক্ত গ্রন্থে সে কথাও উল্লেখ করেছেন (পৃ. ১৫৩)। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে সরোজিনী নাইডু এবং সমাজকর্মী কমলাদেবী



চট্টোপাধ্যায়ের নামও (পৃ. ১৫৮, ১৫৯, ১৬১)। গান্ধির মত মীরাবেনকেও ইংরেজ প্রশাসকেরা বিভিন্ন জেলে সময়ে সময়ে স্থানান্তরিত করেছেন। তিনি লিখেছেন –

“I had just completed a whole year in jail, but that first week at Arthur Road Prison had been undertrial” ...<sup>২৮</sup>

তাঁর সংগ্রাম কখনো দরিদ্র ভারতবাসীর রোগ ব্যাধির বিরুদ্ধে, কখনো দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রচেষ্টা ভালবাসা, সেবা, কৃষির উন্নতি, কুটির শিল্পের উন্নতি ও সনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি কঠিন রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে। এসব পীড়ায় নিজেও আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। প্রায় ৫২-৫৩ বছর বয়সে বিপ্লবী দলের সদস্য পাঞ্জাবী পৃথ্বী সিং (Prithvi Singh) - এর সঙ্গে ১৯৪৪ সালে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হয়নি। এ বিষয়ে বাপুজির সঙ্গে তাঁর সামান্য মতান্তর ঘটে। আবার বাপুজি তাঁর কন্যা মীরাবেনকে পরম স্নেহে কাছে টেনে নেন। পৃথ্বী সিংকে তাঁর গ্রন্থে মীরাবেন উল্লেখ করতে ভোলেন নি (পৃ. ২১৬)। মীরাবেন কর্মের মধ্যদিয়েই ঈশ্বরের সন্ধান পেতে চেয়েছেন। ঈশ্বর সত্য – ‘God is Truth’<sup>২৯</sup> গান্ধিজি একথা তাঁকে বলতেন। প্রত্যুত্তরে শিষ্য মীরাবেন তাঁর বাপুজিকে বলেছেন ‘Truth is God.’<sup>৩০</sup> তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে আমৃত্যু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে গেছেন তিনি। মীরাবেন ঈশ্বর বিশ্বাসের অবস্থান থেকে তাঁর প্রিয় বাপুকে বিবেকানন্দের সমধর্মী বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন –

“I noted in him traits similar to Vivekananda.”<sup>৩১</sup>

ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে শ্রমিক দল ক্ষমতায় এসে সরকার গঠন করেন। সেই দলের প্রধানমন্ত্রী এট্রিলি (Attlee) ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ এক ঘোষণায় জানান, ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ ঘটতে থাকল। গান্ধিজি ২১ দিন অনশন পালন করলেন। অনশন পালনের সেই সময়ে কেবল ফলের রস খেয়েই কাটিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে নোয়াখালিতে ঘটে গেল ভয়ঙ্কর হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ। নোয়াখালি হয়ে উঠল মৃত্যু উপত্যকা। সাতাত্তর বৎসরে উপনীত গান্ধি আর সময় নষ্ট করলেন না। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন। তিনি লিখলেন –

“My ahimsa is on its trial.”<sup>৩২</sup>

– সত্য সত্যই অহিংসার পরীক্ষা সেদিন শুরু হয়েছিল। নোয়াখালির পোড়ো বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে তিনি দাঁড়ালেন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত নরনারীকে আশ্রয় করলেন (পৃ. ২৭৪)। এদিকে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সরকার এক ঘোষণায় ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়সীমা বেঁধে দিলেন (পৃ. ২৭৫)। ধর্মীয় উন্মাদনাকে মীরাবেন গ্রহণ করতে পারেন নি। ঠিক তেমনি হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষকেও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর রচনায় আর এস এস ও হিন্দু মহাসভারও উল্লেখও রয়েছে। এই বাংলার কৃষি ও কৃষক, তাদের লাঙল টানা, ঘাস নিড়ানো, বীজ বোনা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে তাঁর গ্রন্থে। ঘাট মাঠের কচি কচি সবুজের সমারোহে বিশুদ্ধ শ্বাস নিতে পারতেন তিনি। এরপর গান্ধির অনুমতিক্রমে তিনি ‘কিষণ আশ্রমে’ আত্মনিয়োগ করেন। এই আশ্রমের নামকরণ হয়েছিল ‘Pashulok seva Mondal (Pashulok Service Association)’। গান্ধির আদর্শ অনুযায়ী বিশ্বশান্তির জন্য এই প্রতিষ্ঠান। সাতশ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি কো-অপারেটিভ গ্রাম স্থাপিত হল। যেখানে একশ একর জমির মধ্যে গোবাদি পশু চরে বেড়াত। বাদবাকি স্থানে তেল মাড়ানো, বাঁশবেতের কাজ, মৌমাছি পালন প্রভৃতি কাজ হত। মীরাবেন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

“Development of village industries suitable to the area, such as oil pressing, canework, bee – keeping etc.”<sup>৩৩</sup>

১৯৪৮ সালে গান্ধি হত্যার পর তিনি ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমান উত্তরাখণ্ডের ভিলঙ্গানা (Bhilangana Valley) উপত্যকায় তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভগবান কৃষ্ণের নাম অনুসারে ঐ আশ্রমের নাম তিনি রেখেছিলেন ‘গোপাল আশ্রম’। ঐ সময় তিনি ভারতের পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন। তিনি অরণ্যের ধ্বংস সাধন নিবারণের প্রচেষ্টা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিলেন। গান্ধি হত্যার এগার বছর পরে তিনি ইংল্যান্ডে (১৯৫৯) ফিরে আসেন। ঠিক তার এক বছর পরে তিনি অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় (১৯৬০) চলে যান। সেখানে তিনি একেবারেই সাধারণ জীবন যাপন করতে থাকেন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করার হয়তো একটি নিহিত কারণ ছিল। মীরাবেন ছিলেন সঙ্গীতের ভক্ত রসিক। বিশ্বের সুরসম্রাট জার্মানির বিটোফেনের (Ludwig Van Beethoven, 1770 –



1827) ভক্ত তিনি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তীর্থক্ষেত্র ছিল ভিয়েনা। ২৬শে মার্চ ১৮২৭ সালে এক ঝটিকা ক্ষুরকালো ঘন মেঘের দুর্যোগপূর্ণ বর্ষণ জর্জর সকালে ভিয়েনাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। মীরাবেনের প্রিয় শখ ছিল পিয়ানো বাজানো। তাপসী, সাধ্বী মীরাবেনও তাঁর অন্তিম জীবনের জন্য বাস্ক-প্যাটরা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ‘The spirit’s pilgrimage’ গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদে লিখেছেন –

“And I remembered that long ago I had packed away in the box containing Bapu’s Original letters, the volumes that Romain Rolland had given to me in Villeneuve when Bapu had stayed there in 1931 Beethoven – Les Grandes Epoques Creatrices.”<sup>৩৪</sup>

মহান সৃজনশীল সেই স্রষ্টার অনির্ণেয় দেশে অবস্থানকেই তিনি সময়োচিত বিবেচনা করলেন। এই ভিয়েনার মাটিতেই তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

### চার

ভারতকন্যা। তীর্থের দেশ এই সুমহান ভারতবর্ষে দুই বিদেশিনি তীর্থ যাত্রীর পদধ্বনি। প্রেম দিয়ে, মমত্ব দিয়ে ভারতবর্ষের পুজোয়, ভারতবাসীর কল্যাণে দুই তরুণীর এমন মহতী আত্মত্যাগ খুব বিরল ব্যতিক্রমী চ্যুতি বলেই ধরে নিতে হবে। একজন ভগিনী নিবেদিতা, অপরজন মীরাবেন। এঁদের কোন তুলনা-প্রতিতুলনা হয় না। মানব কল্যাণের জন্য মানুষের অনন্ত সাধনা। সেই কণ্টকাকীর্ণ উপল ব্যথিত তপস্যার নির্মলতায় যাঁরা শীর্ষ পথ স্পর্শ করেন, তাঁরাই হয়ে ওঠেন ঋষি। তাঁরা ঈশ্বরের দেশে বিচরণ করেন। যাঁরা তপস্যা কঠিন এমন সাধনা সম্পূর্ণ করেন, অমৃতলোকে অন্তরের দেবতা তাঁদের জন্য প্রতীক্ষা করেন। আলোক প্রাপ্ত ইউরোপের দুই শিক্ষিতা শীলিতা কন্যা এদেশে এসে সর্বত্যাগী হয়েও ভারতবাসীর জন্য রেখে গেলেন অমৃত প্রেমের সবুজ দ্বীপ। কল্যাণরতী দুই দীপশিখাধারিণী বিদেশিনি এই মর্ত্য পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য মানবতার যে আলোকোজ্জ্বল প্রশস্ত পথ নির্মাণ করেছেন শত শত শতাব্দী পরেও মানবজাতির উত্তরপুরুষের কাছে তা অর্ধবহ হয়ে থাকবে। নতুনতর নারীপথ খনন করেছেন এঁরা। ভারত সংস্কৃতিতে এঁদের আসন চিরকালের জন্য অম্লান হয়ে থাকবে। বিশ্বায়ের এই ভারতবর্ষে তাঁদের মানব মহিমার স্বপ্ন-সাধনা এক পরম দিব্যতায় সহস্র সহস্র বৎসর পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির জন্য আলো রেখে যাবে। দু’জনেই ভারততীর্থের মহাসঙ্গমে লীন হলেন। দু’জনেই বলিষ্ঠ কর্মযোগকে জীবনচর্যার অংশভাক করলেন। দু’জনেই নিম্নবর্ণীয় প্রত্যন্ত ভারতবাসীকে ভাল বেসেছেন পরম মমতায়। দু’জনেই দু’হাত উজাড় করে মাঠে-ঘাটে পল্লীর প্রান্তে-প্রান্তরে মানুষের সেবা করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। সত্যকে অবলম্বন করেই পুষ্ট হয়েছে তাঁদের জীবনচর্যা। ব্রহ্মচর্য এবং সংযম পালনের ব্রত নিয়েছেন দুই তরুণী কন্যা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে দু’জনের অবদান বিশ্বায় বিদিত। দু’জনেই শ্রেষ্ঠ পথের শ্রেষ্ঠ মানুষের অনুগমন করেছেন। দু’জনেই আধ্যাত্ম সাধিকার উজ্জ্বল প্রতীমূর্তি। দু’জনেই পল্লি-উন্নয়ন, পল্লি-সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। দু’জনের জীবনধারাই বিকশিত হয়েছে আশ্রমিক পরিমণ্ডলে। দু’জনেই বিপুল কর্ম-পরিকল্পনার মধ্যেও চিঠি লেখা, ডায়েরি সংরক্ষণ এবং গ্রন্থ রচনাকেই সময়োচিত মনে করেছেন। সর্বোপরি, দু’জনেই হয়ে উঠেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির রত্নকন্যা। দু’জনেই হিন্দু সংস্কৃতির উদারতায় লালিত বর্ধিত হয়ে কাজ করলেও সার্বজনীন মানব ধর্মকেই আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ভগবান কৃষ্ণ যেমন ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’য় বলেছেন, আত্মা জন্মশূন্য। আত্মা জন্মগ্রহণ করেন না, অথবা আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা প্রাচীন, ক্ষয়হীন। দেহ বিনষ্ট হলেও আত্মার মৃত্যু হয়না। ঠিক তেমনি ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মস্বরূপ অবিনাশী –

“অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমবায়স্যস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।”<sup>৩৫</sup>

সং পদার্থ ও সংকর্মেরও বিনাশ হয় না। ভগিনী নিবেদিতা এবং মীরাবেন এই দুই মহীয়সী রমণী মানবজাতির মহতী কর্মের অসীম মহাকাশে উজ্জ্বলন্ত ধ্রুব নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করবেন নিশ্চয়ই। কল্যাণপূত কর্মে নিয়োজিত রমণীকে স্বর্গলোকে অনুসন্ধানের কোন অর্থ হয় না। আমাদের এই বাস্তব পৃথিবীর কঠিন দারিদ্র্য জর্জর ঘরকন্নার দীন কুটিরেই তাঁদের দেখা মেলে।

**Reference:**

১. Sister Nivedita, The Samaj, Religion and Dharma, Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas, 1952, p. 32
২. Romain Rolland, Mahatma Gandhi, Shishti Publishers, C.R.Park, New Delhi, 2013, p. 138
৩. ibid, p. 140
৪. ibid, p. 141
৫. Mirabehn, Wikipedia, dated 10.12.2023
৬. Sister Nivedita, Notes of some Wandering with the Swami Vivekananda, The complete works of Swami Vivekananda, volume IX, Advaita Ashrama, Kolkata, July 2009, p. 381
৭. Swami Vivekananda, The complete works of Swami Vivekananda, volume VII (7), Advaita Ashrama, Kolkata, 2008, p. 511
৮. ibid
৯. ibid, volume IX (9), p. 113
১০. ibid, Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda, chapter I, The house on the Ganges, March to May, 1998, vol. 9, p. 340
১১. ibid, The Plague Manifesto, in May, 1898, The complete works of Swami Vivekananda, vol. 9, p. 301
১২. ibid, Sister Nivedita (N. of RK-V) (Nivedita of Ramkrishna – Vivekananda) Our Master and his Message, Introduction, July 4, 1907, vol. I, pp. XV, XVI
১৩. Sister Nivedita, Glimpses of Famine and Flood in East Bengal (printed at the Indian Press, 1907), 'My India, My People,' Sister Nivedita – Pravrajika Atma prana, published by Ramkrishna Sarada Mission, New Delhi, 1995, chapter – I, p.12 – গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত।
১৪. Swami Vivekananda, The complete works of Swami Vivekananda, vol. VI, Advaita Ashrama, Kolkata, 2008, p. 407
১৫. ibid, vol. IX, p. 340
১৬. ibid, vol. IX, pp. 525, 526
১৭. ibid, vol. IX, p. 547
১৮. ibid, vol. IX, p. 415
১৯. Sister Nivedita, Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda, chapter XI, ibid, vol. IX, p. 391
২০. শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা – ৩৮, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২১৯
২১. Mira Behn (Madeleine Slade), The spirit's pilgrimage, Longmans Green and co. Ltd., (Orient longman private Ltd.), London, Calcutta, 1960, p. 99
২২. ibid, p. 65
২৩. ibid, p. 66
২৪. ibid, p. 67
২৫. ibid, p. 87
২৬. ibid, p. 91

২৭. Sereny, Gitta (14 November, 1982), A with Gandhi, The New York Times, ISSN 0362-4331, Retrieved 22 March 2023, Wikipedia, [https://en.m.wikipedia.org/wiki/A\\_with\\_Gandhi](https://en.m.wikipedia.org/wiki/A_with_Gandhi), dated 14/02/2024
২৮. Mira Behn (Madeleine Slade), The Spirits's Pilgrimage, Longmans Green and co. Ltd., (orient Longman pvt. Ltd.), London, Calcutta, 1960, p. 177
২৯. *ibid*, p. 148
৩০. *ibid*
৩১. *ibid*
৩২. *ibid*, p. 274
৩৩. *ibid*, p. 300
৩৪. *ibid*, p. 315
৩৫. শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা - ১৭, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১২১